আয়ানের ব্রহ্মবিদ্যা

মুনতাসির মাহদী

আয়ান সবচেয়ে জ্ঞানী কয়েকজন মানুষের মধ্যে একজন। তার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোয়োশেন্ট) অসাধারণ। একইসাথে তার ইকিউ (ইমোশনাল কোয়োশেন্ট) খুবই ভালো।
কিন্তু তারপরেও তার কিছু সমস্যার কারণে সে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছাতে পারে না!

তার সমস্যাটা হচ্ছে, সে একজন ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান এবং একইসাথে তার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা, ক্ল্যারোডিয়েন্স।

স্পিরিট আর ডেমন নিয়ে কাজ করতে করতে তার মাঝে তৈরি হয়েছে এই ক্ষমতা। যেই ক্ষমতাবলে সে স্পিরিট ও ডেমনদের কথা শুনতে পায়।

আয়ান কথা বলতে পছন্দ করে। কিন্তু তারপরেও একাই রওনা হয়েছে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। ট্রেনের শব্দের সাথে বৃষ্টির ছন্দের মাঝে হঠাৎ এক পরীর আবির্ভাব। কিন্তু ফিনিশিং লাইন ছোঁয়ার সাহস কি আয়ানের আছে?

'আয়ানের ব্রহ্মবিদ্যা' পড়লে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে!

বইটির অরিজিনাল কপিই হচ্ছে পিডিএফ এবং বইটি সম্পূর্ণ ফ্রি!

যেহেতু এটা ডাউনলোডেবল ফাইল সেহেতু এটা ডাউনলোড করে পড়তে পারবেন। ডাউনলোড করতে হবে মুনতাসির মাহদীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের লিংকঃ

www.muntasirmahdi.info

উৎসর্গ

আমার জীবনের সত্যিকারের 'পরী'কে!

যাকে আমি আমার পরিবারের পরে একমাত্র বাইরের মানুষ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম, ভালোবাসিও!

'পরী'

ভালোবাসি গো…!

অনেক অনেক বেশি!

- মুনতাসির মাহদী

সিলেট, বাংলাদেশ।

শাফিনকে কতবার তার বাসার নিচে গিয়ে ডাকলাম তার ইয়ত্তা নেই। তারও কোনো খোঁজখবর নেই। শাফিনের কথা ছিলো আমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। আমি কক্সবাজার যাচ্ছি। রাতের ট্রিপ। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি আমার ভালো লাগে না। যাদের বৃষ্টি ভালো লাগেনা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা কবিতাও পছন্দ করেন না। আমিও কবিতা খুবই অপছন্দ করি। কারণ, কবিতার ভাষা আমি বুঝি না। ততটা জ্ঞানী আমি নই। আর একইসাথে কবিতা পাঠ আমার কাছে জঘন্য মনে হয়।

যাদের কাছে কবিতা পাঠ ভালো লাগে তারা আবার এটা পড়ে মনে আঘাত পাবেন না দয়া করে। আমি এমনই। কারো একটা কিছু ভালো লাগে নি, আমি চেপে যেতে পারি না। হয় নিজেকে নিজেই বলি নাহলে তার সামনেই সেটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

শাফিনের মুখের উপরেই তাকে হাজারবার বলেছি যে, সে গাধা। একেবারে গন্ডমূর্খ। যদিও সে গন্ডমূর্খ নয় কিংবা গাধাও নয় কিন্তু সে আমার সাথে চলার মতো মানুষ নয়। আমি আবার আমাকে নিয়ে গর্ব করছি না। শাফিনের আইকিউ ১৪৬। আমার আইকিউ ১৫৮। আইনস্টাইনের আইকিউ ছিলো ১৬০।

আমি এসব ভাবছি আর শাফিনকে মিসড কল দিচ্ছি। মিসড কল দিচ্ছি বললে ভুল হবে। আমি কল দিচ্ছি আর সে কেটে দিচ্ছে। সমস্যাটা কি তার? সে কি আমাকে এগিয়ে দেবে না? প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে আমি তার বাসার নিচে দাঁড়িয়ে ভিজছি। শেষবারের মতো তাকে কল দেবো। যদি সে না বেরোয় তাহলে আমি একাই রওনা দেবো। অলরেডি আমি পাঁচ মিনিট লেট। আরো পাঁচ মিনিট আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়ার কথা। কিন্তু কি আর করা! বাংলাদেশের ট্রেন!

শাফিন এবার ফোন ধরলো!

আমি হুংকার দিয়ে বললাম, "তুই কোথায়?"

শাফিন উত্তর দিলো, "নামছি! আর দেখছিস না বৃষ্টি হচ্ছে!"

আমি বললাম, "তোর কি করার কথা ছিলো? আমি অলরেডি ৫ মিনিট লেট!"

শাফিন বললো, “ট্রেন এখন আসবে না। ট্রেন আসতে লেট আছে। তুই একটা কাজ কর! তুই আমার বাসায় চলে আয়! একসাথে বের হবো!”

আমি আর বাসায় গেলাম না। বৃষ্টি আসলে পড়ছে না বললেই চলে। যদিও হঠাত হঠাত দু একফোঁটা এসে মাথায় পড়ছে ঠিকই। এখন আর ওর বাসায় গিয়ে লাভ নেই। আমি বরঞ্চ রাস্তার ধারের বেঞ্চে বসে একটা সিগারেট ধরাই।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে মাথায় একটা কথা ঘুরছে। কথাটা হচ্ছে, একটা সিগারেটে প্রায় ৪৮০০ কেমিক্যাল থাকে, যেখানে মাত্র ৬৯টি কেমিক্যাল ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। আর বাকিগুলো কি করে? অন্য কোনো রোগ উপহার দিয়ে যায়?

সিগারেটে চুমুক দিতেই বিদ্যুৎ চমকালো। বৃষ্টি বাড়বে। রাস্তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। কিছুক্ষণ পর পর দুয়েক ফোঁটা করে পড়ছে। আচ্ছা রাস্তার কথায় আরেকটা কথা মনে পড়লো।

জানেন কি? বৃষ্টি কিন্তু সবসময় রাস্তা ভেজায় না। যেখানে অনেক বেশি তাপ, অনেক বেশি গরম; সেসব জায়গায় বৃষ্টি রাস্তায় পড়ার আগেই হাওয়া হয়ে যায়। এটাকে অনেক এনভায়রনমেন্টালিস্ট ‘ফ্যান্টম রেইন’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমার বৃষ্টি ভালো লাগেনা ঠিকই কিন্তু বৃষ্টির ঘ্রাণ অসাধারণ মনে হয়। বৃষ্টির ঘ্রাণ কিন্তু কয়েক ধরনের। ভালোভাবে খেয়াল করতে বুঝতে পারবেন! বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে প্রকৃতিতে যে ঘ্রাণ পাওয়া যায় সেটা কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার সময় বা বৃষ্টির পর যে ঘ্রাণ পাওয়া যায় সেটার সাথে মেলে না। এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, পানির তো কোনো ঘ্রাণ নেই। তাই না? তাহলে বৃষ্টির ঘ্রাণ আমরা কোথা থেকে পাই? এর কারণ হচ্ছে, মাটিতে থাকা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। যখন বৃষ্টি মাটিতে পড়ে তখন এটা এক ধরণের বাতাসের থলে তৈরি করে। যেখানে কিছু পরিমাণ জিওসমিন থাকে। এই জিওসমিন মূলত মাটিতে বাস করা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। যখন সেই জিওসমিন আমাদের নাকে আসে তখনই আমরা বাতাসে এর ঘ্রাণ পাই।

বেশ মজার ব্যাপার তাই না? জানেন? বৃষ্টির এই ঘ্রাণের আলাদা একটা নামও আছে! সায়েন্টিস্টরা এটাকে ডাকেন ‘পেট্রিকর’ হিসেবে।

আমার হাতের সিগারেট প্রায় শেষের দিকে। শাফিনের এখনো কোনো খোঁজখবর নেই। অবশ্য সে যখন বলেছে ট্রেন ছাড়তে আরো দেরী হবে, তখন আসলেই ট্রেন এত সহজে ছাড়বে না। শাফিনের সাইকিক ক্ষমতা আছে। তার সাইকিক ক্ষমতা প্রধান চারটি ইএসপি ক্ষমতার মাঝে একটি, প্রিকগনিশন। সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। আমি ক্ল্যারোডিয়েন্স, আমি স্পিরিট বা ডেমনদের কথা শুনতে পাই।

শাফিনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে একটা ট্রেন স্টেশনেই। ছয় বছর আগে আমি তখন ঢাকা থেকে সিলেট ফিরছিলাম। শাফিনও সেই একই ট্রেনে করে সিলেট ফিরছিলো। ওয়েটিং জোনে আমি আর শাফিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে সাধারণত কথাই বলি না। সেদিন সিগারেট ধরানোর জন্য শাফিনের কাছে লাইটার খুঁজেছিলাম। আসলে খুঁজেছিলাম বললে ভুল হবে। খোঁজার আগেই শাফিন হাত বাড়িয়ে লাইটার দিলো। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। প্রথমত কো-ইন্সিডেন্স হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। সিগারেট শেষ করে বাথরুম থেকে ফিরতেই দেখি শাফিন আমার কাছে এসে বললো, "আপনার ব্যাগ চুরি হয়ে যাবে! পেছনের লোকটা বারবার আপনার ব্যাগের দিকে তাকাচ্ছে!" আমি ব্যাগ সামনে আনতে না আনতেই ব্যাগ ধরে টান দিলো পেছনের লোকটা। কিন্তু ব্যাগের বেশিরভাগ অংশই আমার গ্রিপে থাকায় লোকটা আর তেমন কুল কিনারা করতে পারলো না।

মজার ব্যাপার কি হয়েছিলো জানেন? সেদিন আমি একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম। বাংলাদেশের মানুষ আপনার উপকারে আসুক আর নাই আসুক, তারা একটা জিনিস খুবই ভালো পারে। সেটা হচ্ছে, 'ঘটনাকে টেনে লম্বা করা'। যে লোকটা আমার ব্যাগ চুরি করতে চেয়েছে সেটা আমার সামনে থাকা আরেকটা লোক দেখছিলো। সে কিন্তু আমাকে সেটা বলে নি। শাফিন না বললে আমি সেটা বুঝতেও পারতাম না। কিন্তু যেই না লোকটা ব্যাগে টান দিলো, ওমনি সেই সামনের লোকটা চোরকে ধরে বেশ কয়েকটা লাথি দিয়ে দিলেন। আমি আটকাতে গিয়েও আটকাই নি। ভাবলাম দেখি কি হয়! তারপরে কি হয়েছিলো জানেন? আশপাশ থেকে আরো প্রায় দশ পনের জন হাট্টাখোট্টা জোয়ান এসে সেই চোর ব্যাটাকে আরো বেশ কিছুক্ষণ ধোলাই দিলো। চোর ব্যাটা চুরি না করেই মার খাচ্ছিলো। আমি সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শাফিনের কাছে গিয়ে বললাম, "ধন্যবাদ আপনাকে! আপনি সাইকোলজিস্ট? বা বিহেভিয়ারিস্ট? আসলে আপনার এটেনশন স্কিল অনেক দক্ষ তো সেজন্যেই বলছিলাম!"

শাফিনের উত্তর ছিলো, "জ্বি না! আপনাকেও ধন্যবাদ!"

আমি বললাম, "কি মনে হয়? আজকে ট্রেন আসবে?"

শাফিন উত্তর দিলো, "জ্বি না! আজকে ট্রেন আসবে না!"

উত্তর শুনে আমি হেসে ফেললাম। এটাকে সারকাজমের মধ্যে ফেললে এটা বেশ হাস্যকর একটা কথা। কিন্তু শাফিনের চেহারায় সেদিন কোনো হাসি ছিলোনা। আমি শেষমেষ অনেক ভেবেই প্রশ্ন করে বসলাম, “আপনি কি প্রিকগনিটিভ ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত?”

শাফিন বেশ অবাক হয়ে গেলো। এবার তার চেহারায় আমি খুশির রেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। শাফিন বললো, “আপনি কি সায়েন্টিস্ট?” আমি হেসে বললাম, “আজ্ঞে না! আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আপনি?” শাফিন আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলো। শাফিনের চেহারা আবার ভেঙে গেলো। আমি শাফিনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম যে, শাফিন কোন ধরনের উত্তর আশা করছে! কিন্তু সেটা দেয়াটা ঠিক হবে কি না, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না।

শাফিনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, “আপনার সাইকিক পাওয়ার অসাধারণ। আপনি যদি সত্যি প্রিকগনিশন ক্ষমতাধারী হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই যে আমার কার্ড!”

তার পরের দিনই শাফিন আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। তার পর থেকে একসাথে আমরা প্রায় ছয় বছর ধরে আছি। শাফিন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে আমাদের বন্ধুমহলে। যদিও আমি বেস্ট ফ্রেন্ড নামক কিছুতে বিশ্বাস করি না।

যাই হোক, অনেক্ষণ ধরেই শাফিনের অপেক্ষা করছি। এখন প্রায় সাতটার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার কথা সাড়ে ছয়টায়। শাফিনের আবার হাইপারসোমনিয়া আছে। যেখানে সেখানে যখন ইচ্ছা ঘুমোতে পারে। আমি তাকে ফোন দিতেই সে ফোন কেটে দিয়ে নিচে নামলো। সিগারেট ধরাতে ধরাতেই নিচে নামলো সে।

আমার হাতে সিগারেটটা দিয়েই বললো, “তোর এই একাকী চিটাগাং ভ্রমণ না করলেই নয়?”

আমি সিগারেটে চুমুক দিয়ে বললাম, “তোকে তো বলেছিলাম যাওয়ার জন্য। তুই রাজি হোস নি!”

শাফিন বললো, “যা, তোর যখন ইচ্ছে। আমি ঘুম থেকে উঠে এসেছি। শুধু তোকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। বাই দ্যা ওয়ে, কতদিনের জন্য যাচ্ছিস?”

আমি উত্তর দিলাম, “বেশি না। পাঁচদিন!”

শাফিন জিজ্ঞেস করলো, “কোথায় থাকবি?”

আমি হেসে বললাম, “কেনো? তুই পরে চলে আসবি?”

শাফিন অট্টহাসি দিয়ে বললো, “আমাকে তোর গার্লফ্রেন্ড পেয়েছিস?”

আমি মুচকি হেসে আকাশের দিকে তাকালাম। শাফিনকে প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতো বৃষ্টি কেমন হবে? নাকি হবেই না?”

শাফিন বললো, “আমি কিভাবে বলবো? আমি তোর মতো অতটা জ্ঞানী নই বাবা!”

আমি বললাম, “জানিস, ছয় ধরণের মেঘ আছে। যে ছয় ধরনের মেঘের দিকে তাকালেই এর অবস্থা বোঝা যায়।”

শাফিন বললো, “আমি তো সব মেঘকেই সমান দেখি!” (বলেই হাসতে শুরু করলো!)

আমি বলতে শুরু করলাম, “এই ছয় ধরণের মেঘের নাম হচ্ছে, সিরাস, সিরোকিউমুলাস, কিউমুলনিম্বাস, নিম্বোস্ট্র্যাটাস, সিরোস্ট্র্যাটাস এবং কিউমুলাস হিউমিলিস। সিরাস যেটা, সেটা অনেক পাতলা হয়ে থাকে, তুই দেখলেই চিনবি। এরা হালকা ধাঁচের হয়। এসব মেঘ দেখলেই বোঝা যায় যে, ঝড় হবে খুব শীঘ্রই। সিরোকিউমুলাস যেটা, সেটা ছোটো ছোটো চারকোনা বা বলের মতো হয়ে থাকে। এসব মেঘ মূলত শান্ত আবহাওয়া বোঝায় কিন্তু এর আরেকটা মানে হচ্ছে বাতাস ঠান্ডা হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিউমুলনিম্বাস যেটা, অনেক ভারী মেঘ হয়ে থাকে। পাহাড়ের মতো বিশাল আকারের হয় দেখতে। এদের মানে হচ্ছে, প্রচন্ড বৃষ্টি হবে আর সাথে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিম্বোস্ট্র্যাটাস যেটা, কালো কিংবা ছাই রঙয়ের হয়ে থাকে। মনে হয় একেবারে মাটি ছুঁয়ে ফেলবে মেঘে। এদের মানে কি জানিস? এর মানে হচ্ছে, হালকা বৃষ্টি হবে কিন্তু এর সাথে বিদ্যুৎ চমকাতে পারে অথবা তুষারপাত হবে। সিরোস্ট্র্যাটাস যেটা, এদের দেখলে মনে হয় কাগজের তৈরি মেঘে সারা আকাশ ঢেকে রেখেছে। এদের মানে হচ্ছে, ১৫ বা বিশ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হবে। আর সাথে বিদ্যুৎ চমকানো আর হালকা বজ্রপাত ফ্রি! আর সর্বশেষ কিউমুলাস হিউমিলিস যেটা, একটু দূরে দূরে সুন্দর আকার আকৃতির মেঘ দেখা যায়। এর মানে হচ্ছে প্রকৃতি বেশ শান্ত। মেঘ বৃষ্টি কিছুই হবে না। বেশ অসাধারণ না?!

শাফিন বললো, “হ্যা কিন্তু আমি তো এখন মেঘই দেখছি না! তাহলে এর মানে কি বুঝবো!”

আমি উত্তর দিলাম, “স্বাভাবিক! পরিবেশ শান্ত! আশেপাশে তাকিয়ে দেখ!”

শাফিনের মনে হয় আমার বকবক আর ভালো লাগছে না। সে কানে ইয়ারফোন গুঁজে দিলো। আমি চুপচাপ বৃষ্টির ঘ্রাণ নিতে নিতে এগুচ্ছি।

স্টেশনে ঢুকেই দেখি বেশ কিছু ছেলেমেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরপর তারা চিৎকার করে হাসছে। তিনটা ছেলে, দুটো মেয়ে। মনে হয় পিকনিকে যাচ্ছে চিটাগাং। শাফিন কান থেকে ইয়ারফোন খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “তোর খাবার দাবার কিছু লাগবে না?”

আমি বললাম, “না! আমি সাথে নিয়ে নিয়েছি। আর পারলে একটা কোক কিনে নিয়ে আয়!”

শাফিন কাশতে কাশতে দোকানের দিকে হাঁটা দিলো। শাফিন অসুস্থ। এর কারণ অবশ্য আমি নিজেই। একবার শাফিনের উপর প্রটেকশন স্পেল পড়তে গিয়ে, আনডেড স্পেল পড়ে দিয়েছিলাম। পরে আর কি!

শাফিনের রক্তের গ্রুপ প্রত্যেক তিনমাস পরে পরে পরিবর্তন হয়। শাফিন অবশ্য এটা জানে না। আর এটা জানলেও সে কিছুই বলবে না। কারণ আমি সেদিন রাতে মাতাল ছিলাম। যার ফলে কি করতে কি করেছি আমার খেয়াল ছিলো না সেটা।

আমি দাঁড়িয়ে সেই তরুণতরুণীদের হাসি দেখছি! একটা ছেলে ততটা খোলামেলাভাবে হাসছে না। তারা যেভাবে হাসছে, সেটাকে বলে ওপেন মাউথ স্মাইল। যদিও সেটা ফেইক করা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই হাসিটাও মিথ্যে করে দেয়া যায়। হাসি দেখলেই সেটা বোঝা যায়। ওদের হাসি আর ভালো লাগছে না।

আমি ব্যাগ থেকে বই বের করে, স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসলাম। ব্যাগ ভারী হয়ে আছে। সবকিছুই এক ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আরো একটা ব্যাগ হলে ভালো হতো। যাক, কি আর করা!

আমি যে বইটা পড়ছি, সেটার নাম সাইক - ওয়ান জিরো ওয়ান। পল ক্লাইনমেনের অসাধারণ এই বইটিতে একসাথে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক সেকেন্ডেই শেখার নতুন কিছু থাকছে বইটিতে। যদিও বইটি এর আগেও আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি কিন্তু তারপরেও বারবার পড়তে ইচ্ছে করে।

শাফিন এসে আমার ব্যাগে কোক ঢুকিয়ে রাখলো। আমি বই থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই শাফিনের কাঁধের কাছে কিছু একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। পাত্তা দিলাম না। ওসব আওয়াজ দিনে এখন বিশ-পঁচিশবার শুনতে পাই।

শাফিন বললো, "চল ট্রেন চলে আসবে এখন!"

আমি শাফিনের পেছন পেছন হাটতে থাকলাম। শাফিনের কাঁধের কাছ থেকে আবার একই আওয়াজ শুনলাম। শাফিনকে ডাক দিলাম পেছন থেকে।

আমি বললাম, "তোর আশেপাশে কিছু একটা আছে!"

শাফিন জিজ্ঞেস করলো, "কি আছে?"

আমি বললাম, "মে বি লোয়ার লেভেলের কোনো ডেমন!"

শাফিন নাকমুখ কুঁচকে বললো, "প্লিজ ভাই ওটাকে সরিয়ে দিয়ে যা! এসব নিয়ে এখন বাসায় যাওয়া সম্ভব না।"

আমি হেসে শাফিনের কাঁধে হাত রেখে পড়তে শুরু করলাম!

"হাসসাতান, আনা শামুর আয়াল খাভেরে ইম জেহ মাহ শেখেম! হাসসাতান, আনা শামুর আয়াল খাভেরে ইম জেহ মাহ শেখেম! হাসসাতান হু এলোহিম!"

আমি চোখ খুলতেই শাফিন বললো, "তুই এত ভাষা মনে রাখিস কিভাবে?"

আমি হেসে বললাম, "তুই এত ভয় পাস কীভাবে?"

শাফিন সিগারেট ধরালো। দুজনেই আমার কেবিনে ঢুকলাম। শাফিন বললো, "তুই একা যাবি! পুরো কেবিন কেনো নিলি?"

আমি বললাম, "আমি শান্তিতে ঘুমোতে না পারলে জার্নি করতে পারবো না। তুই ভালোমতোই জানিস!"

শাফিন সিগারেটে টান দিয়ে বললো, "ট্রেন ছেঁড়ে দেবে এখনই। আমি চলে যাচ্ছি। আর কাল কথা হবে ফোনে।"

আমি আমার কেবিন গোছাতে শুরু করলাম। কেবিনের এক সাইডে আমার ব্যাগ রেখে মোবাইলটা চার্জে লাগালাম। জুতোটা খুলে ফেলা দরকার। তারপরে বই হাতে নিয়ে ট্রেনের শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে চা পান করতে করতে পড়াশোনা করা যাবে।

আহা! দৃশ্যটা ভাবতেই শরীরের লোম আনন্দে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!

কিসের কি! কখন ঘুমিয়েছি আমার হুঁশই নেই! বাথরুমে যাওয়া দরকার। সমস্যা হচ্ছে, আমি এই কেবিনে মেয়েদের ঘ্রাণ পাচ্ছি। মেয়েদের শরীরের ঘ্রাণ খুব সহজেই আলাদা করা যায়।

তাহলে কি আমার আগে এই কেবিনে কোনো মেয়ে ছিলো? কিন্তু ঢোকার সাথে সাথেই কেনো ঘ্রাণ পেলাম না? তারমানে আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় কেউ এসেছে এখানে! কিন্তু কীভাবে? দরজা তো...!

আমি চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজা আগে থেকেই খোলা। আমি পেছন ফিরেই দেখি, কেবিনের যে সাইডে আমার ব্যাগ রাখা ছিলো সেখানে আমার ব্যাগ নেই। ফোন চার্জে লাগানো ছিলো, ফোনটাও নেই। প্যান্টের পেছনে হাত দিলাম। যাক মানিব্যাগটা অন্তত আছে। ওটা নেয় নি!

আমার রাগ উঠছে বুঝতে পারছি। কিন্তু রেগে তো কোনো লাভ নেই। দোষ তো আমারই। এসেই মরার মতো ঘুমিয়ে পড়েছি। দরজাটাও লাগাতে মনে নেই। কি যে করবো! কিছুই মাথায় আসছে না!

নেক্সট স্টপেজে থামা দরকার। একটা মোমবাতি লাগবে। ব্যাগে একটা বই আছে। ম্যাজিক্যাল বুক! প্রায় দেড়শ মন্ত্র দিয়ে এই বই যিনি লিখেছেন তিনি বই লেখা সম্পন্ন করার পরের দিনই মারা গিয়েছেন। বইটি শেষমেষ উনার ছেলে মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধিয়েছে। কারণ, মানুষের চামড়ার গন্ধ অনেক ধোয়ার পরেও যায় না। বইটা আমি অনেক কষ্ট করে নেপালের এক বস্তি থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম। যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে বইটাতে আমি একটা স্পেল পড়ে রেখেছি। এতে করে বইটা হারিয়ে গেলেও যাতে বইটাকে সহজে ট্র্যাক করা যায়। এটাকে জাদুর ভাষায় বলে ‘স্ক্র্যায়িং’! এক্ষেত্রে আমাকে সাদা একটা পৃষ্ঠার মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে আমার রক্তের কয়েক ফোঁটা ফেলতে হবে। তারপরে সেই বইয়ের সাথে যুক্ত করা মন্ত্রটা পড়লেই বইয়ের অবস্থান সেই সাদা কাগজে ভেসে উঠবে।

কিন্তু তার আগে ক্ষিধে লেগেছে। কিছু খাওয়া দরকার। সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে গেলাম! বাংলাদেশ ট্রেনের বাথরুমের অবস্থা খুবই বাজে। এতটাই বাজে যে, বাথরুমের আয়না খুলে কেউ কেউ নিয়ে যায় আর আয়নার জায়গায় লেখা থাকে, “আমার ভেবে নিয়ে গেলাম। ভালোবাসতে এই নাম্বারে ফোন করুন!”

এসব দেখে সিগারেট খাওয়ার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেলো। আগেও মুড নষ্ট ছিলো, এখন আরো নষ্ট হলো। কি করা উচিত?

মুড নষ্ট হয়ে গেলে ইন্সট্যান্টলি মুড ঠিক করার কিছু কায়দা অবশ্য আমার জানা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বেশি করে খাওয়া দরকার। আর বেশি করে পানি পান করতে হবে। মাঝে মাঝে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাওয়ার কারণে মনের অবস্থাও ততটা ভালো থাকে না। যার ফলে কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ লাগে।

খাওয়ার জন্য কেবিনের দরজা আটকে দিয়ে ট্রেনের ক্যান্টিনের দিকে রওনা দিলাম। কখনো ট্রেনের ক্যান্টিনের খাবার খাই নি। কেমন হবে জানি না!

ভরপেট কিছু খাওয়া উচিত। আমি আবার ভাত জাতীয় খাবার কম খেতেই পছন্দ করি। এক বসাতে আস্ত মুরগী খেয়ে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব কিন্তু এক প্লেট ভাত শেষ করার খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় আমার জন্য। এখানে তো আর মাংস পাওয়া সম্ভব না, কি আর করা! বরঞ্চ দুই একটা স্যান্ডউইচ খেয়েই রাত কাভার করা যাক।

আমি স্যান্ডউইচ অর্ডার করতে যাব, এমন সময় দেখি আমার পাশের সিটে দুটো বাচ্চা নিয়ে এক মহিলা বসে আছেন। তারা মাংস জাতীয় কিছু খাচ্ছেন। আমি উঠে গিয়ে বসলাম তাদের পাশে। মহিলা আমার দিকে ভয়ংকর চোখে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ করে অপরিচিত কেউ এসে দুই বাচ্চার পাশে বসে গেলে স্বাভাবিকভাবেই যেকারো ভয় পেয়ে যাবার কথা।

আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে বললাম, “আফনারার বাসা কাজিপাড়া না নি?” (সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছি কারণ মহিলার বাসাও সিলেটেই। কারণ মহিলা পান চিবুচ্ছিলো। আঞ্চলিক ভাষাতেই মহিলার বাচ্চাদের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো। যার ফলে মহিলাকে সিলেটের অধিবাসী হিসেবেই ধরে নিলাম। একইসাথে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার কারণে মহিলা আমাকে তার পরিচিত কেউ হিসেবেই ভেবে নেয়ার চেষ্টা করবে।)

মহিলা পানের পিক ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “না না! আফনার বাসা কই?” (মহিলার একটা হাত উনার ব্যাগের উপর পড়লো। সাবকন্সাশলি উনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।)

আমি বললাম, “আমার বাসা তাতিপাড়া। কাজিপাড়া তো যাওয়া ফরে আমার! ভাইছাবরে আমি চিনি তো। ভাইছাব ফর্সা না নি? ভাইছাবর সাইজ অউ অতো উঁচা না নি?” (আমি হাত দিয়ে একটা সাইজ দেখালাম। হাত দিয়ে সাইজ দেখানোর কারণ, এতে করে আপনি যে কারো সাইজই আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু লম্বা না খাটো এ দুটোর মধ্যেও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু হাত দিয়ে দেখানো সাইজের কোনো মত নেই। আর মহিলার স্বামীর গায়ের রঙ ফর্সা হওয়ার কারণ হচ্ছে, মহিলার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা আর মহিলার বাচ্চা দুটোর গায়ের রঙ ফর্সা। অন্যদিকে বাচ্চা দুটো কথা বলতে পারে এবং বেশ বড়ও বলা যায় এদের। বাচ্চাদের গায়ের রঙ তাপমাত্রা, গোত্র, বাবা-মায়ের গায়ের রঙ, বাচ্চার বয়স এবং স্বাস্থ্যের কারণেও পরিবর্তন হতে পারে। এসব বিষয় মিলিয়ে দেখলে বাচ্চা দুটোর গায়ের রঙ এখনো পরিবর্তন হয় নি। সে হিসেবে মহিলার স্বামীর গায়ের রঙ ফর্সা হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।)

মহিলা বললেন, “অয় অয়! আফনে তাইনরে চিনইন নি?” (মহিলা এবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে! কিন্তু মহিলাকে আর প্রশ্ন করতে দেয়া যাবে না। শেষে মহিলা তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাকে! তবে সন্দেহ করার কারণ আর দেখছি না। মহিলার এক হাত এখন আরেক হাতের উপর। তার মানে হচ্ছে মহিলা এখন রিল্যাক্সড।)

আমিও আমার হাতের উপর হাত রাখলাম। এটাকে বলে মিররিং। মহিলা যেভাবে তার হাতের উপর হাত রাখলো, একই জেসচার আমিও দেয়ার কারণে মহিলা নিজেকে এখন কমফোর্ট জোনে ফেলবে।

আমি বললাম, “অয় অয়! চিনতাম না কেনে? ভাইছাব ব্যবসা করইন না নি?” (আরো ভেতরে ঢোকার চেষ্টা। আমি এটা জানি যে, সিলেটের কাজিপাড়ার বেশিরভাগ মানুষ ব্যবসা করেন। তো সে হিসেবে দেখলে আমার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি।)

মহিলা বললেন, “অয় অয়! আফনার নাম কিতা?” (মহিলা আমার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন।)

আমি বললাম, “আমার নাম মালেক! তাইনরে জিকাইবা তাইন আমারে চিনবা!” (প্রত্যেক এলাকার কিছু আঞ্চলিক নাম থাকে, যেগুলো শুনলেই ধারণা করা যায় মানুষটার আসল ঠিকানা সম্পর্কে। আর একইসাথে আমি ফ্রেমিং এফেক্ট ফলো করছি। আমি মহিলাকে বেশ জোর দিয়ে বলছি যে উনার স্বামী আমাকে চিনবেন। এতে করে মহিলার মধ্যে আমার সম্পর্কে পজিটিভিটি জাগ্রত হচ্ছে।)

মহিলা বললেন, “আইচ্ছা!”

আমি বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিতাবা তোমার নাম কিতা?" (আমি মহিলাকে আর প্রশ্ন করতে দিচ্ছি না! সরাসরি উনার বাচ্চাদের কাছে চলে আসলাম।)

দুই বাচ্চার মধ্যে ছোটোটাকে প্রশ্নটা করতেই সে উত্তর দিলো, "নাহিয়ান!" আর বড়টা উত্তর দিলো, "নিলয়!"

মহিলা হঠাৎ করে বলে উঠলেন, "আফনে কই যাইরা?"

আমি বললাম, "আমি চিটাগাং যাইরাম। একটু কাম আছিল আমার! আফনে?" (৯৩ শতাংশ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নির্ভর করে কথার উপর। যত বেশি কথা বলবেন তত বেশি কাছে পৌঁছাতে পারবেন।)

মহিলা উত্তর দিলেন না সেটা। তবে বললেন, "ওহ!"

আমি বললাম, "ভাইছাব কই? ভাইছাবরে দেখরাম না!" (একথা বলেই মাথা আশেপাশে ঘুরালাম! এতে করে মহিলার ধারণা হবে যে, আমিও মহিলার স্বামীর সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক। এতে করে মহিলা আমার উপর এক ধরনের ভরসা পাবেন। বুঝতে পারবেন যে, আমি সত্য কথাই বলছি!)

মহিলা বললেন, "ওহ, তাইন যাইরা না! আমার ভাই সামনর স্টেশনো আইয়া উঠবা!"

আমি বললাম, "ওহ আইচ্ছা আইচ্ছা! তে ভাইর লগেও দেখা অইজিবো! ভালাউ হইলো!" (একই সাথে মুখে কষ্ট নিয়ে খুশি হওয়ার কারণে মহিলা কিছুটা ধান্দায় পড়ে যাবে। মহিলা ভাববেন, তিনি হয়তো ভুল কিছু বলেছেন। যার ফলে তিনি নিজেকে দোষী মনে করবেন। এটাই হবে আমার ভালো একটা চান্স!)

মহিলা এবার পুরো রিল্যাক্সড! কারণ মহিলা ভাবছেন উনার আগের প্রশ্নটা কেমন যেনো ছিলো! এখন যদি আমি মহিলাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে পারি তাহলে মহিলা সহজেই আমার উপর ইম্প্রেসড হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, "তো নিলয়! কোন ক্লাসও পড়রায়?" (সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার চেষ্টা।)

নিলয় বললো, "ক্লাস থ্রি!"

আমি এবার মহিলার দিকে তাকাতেই দেখি মহিলা পান বের করলেন আরেকটা। আমি বললাম, "পান বেশি খাইন না যেনো! আইজকালকুর পানও ভালা নায়!"

মহিলা এবার তার পছন্দের একটা বিষয় খুঁজে পেলেন। সিলেটের প্রায় প্রত্যেক ঘরের মহিলারাই পান চিবুতে পছন্দ করেন। আর তারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলতেও বেশ আগ্রহী থাকেন। এই মহিলাও এর ব্যাতিক্রম নন! তিনি গত বিশ মিনিট ধরে 'পান কী' থেকে শুরু করে 'পান কত প্রকার, কী কী, কীভাবে খায়, কোথায় থাকে, কোন পান ভালো, কোন পানে ক্ষতি বেশি' এসব নিয়ে বকবক করছেন!

আমিও বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছি। যদিও আমার মন পড়ে আছে চিকেন গ্রিলের দিকে। বাচ্চা দুটো আস্তে আস্তে খাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে তারা মাত্র দু পিস খেয়েছে।

এবার আমি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ক্যান্টিনের বয়কে ডাক দিলাম। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “না রে বা! ইতা বালা নায়! বইনোর লগে মাতরা যখন তে বইনোর গেছে খাবার খুজতা পারতা। কিতা খাইতা কউক্কা! বাসা তাকি বহুত খাবার লইয়া আইচ্ছি! অত খাবার কে খাইতো!”

আমিও এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। সিলেটের মানুষ খুব বেশি আত্মীয়তাপরায়ন হয়ে থাকে। তারা সহজেই মানুষকে কাছে টানতে পারে আবার খুব সহজেই মানুষকে দূরে ঠেলতে পারে। এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়, আত্মীয়তা করতে হয়। আপনি একবার কোনো সিলেটের লোকাল পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে পারলে তারা আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। সিলেটের মানুষ আবার বাইরের জেলার মানুষকে দেখতে পারে না। এইজন্যেই তারা বেশিরভাগ সময়েই হয় সিলেটের ভেতরের মধ্যেই ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে না হয় একেবারে দেশের বাইরে! এটা কেনো! এর উত্তর আমার এই ১৫৮ আইকিউ দিয়েও ধরতে পারলাম না এখন পর্যন্ত! আরেকটা কথা, আমি সিলেটের লোকাল পরিবারে বড় হই নি ঠিকই কিন্তু আমার রক্তেও সিলেট রয়েছে। আর তাই বলেই যে সিলেটের সুনাম করছি তা কিন্তু নয়!

যাই হোক, ওখান থেকে খাবার খেয়ে আমার কেবিনে চলে আসলাম। কেবিনে এসে প্ল্যান করলাম তারপরে কি কি করবো! মাথার মধ্যে প্ল্যানিং করাটা খুবই সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে তো এটা আরো সমস্যা হয়ে গিয়েছে। আমার ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো আর মনে থাকে না। সেদিন শাফিনের বাসার সামনে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু শাফিনের নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারলাম না। পরে ফোন বের করে আরো পাঁচ মিনিট প্রায় মনে করতে হলো যে আসলে আমি কাকে খুঁজছিলাম!

এক কাপ কফি হাতে নিয়ে সিগারেট ধরালাম। ধরাতেই দেখি দরজায় কে যেনো ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি টি.টি সাহেব দরজার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি টিকেট দিয়ে উনাকে আগে বিদেয় করলাম। উনি আমার হাতের সিগারেটের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। আমি সেটা সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করলাম। আপাতত আইন ঝাড়তে ইচ্ছে করছে না। কারণ আমি নিজেই আইন ভেঙে বসে আছি।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি আর বাইরের ঝুম বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে, বলের মতো ঘোঁট পাকাচ্ছে, আবার হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

আমি কিছু একটা ভাবতে যাচ্ছিলাম আর তখনই আবার দরজায় ধাক্কা! মানুষের সমস্যাটা কি? ভিক্ষুকরাও কি এখন কেবিনে কেবিনে গিয়ে ভিক্ষা করে? নাকি টি.টি সাহেব কোনো আইনের লোক নিয়ে এসেছেন ট্রেনে সিগারেট খাওয়ার উপকারিতা আর অপকারিতা শোনাতে! যাই হোক, কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দরজা খুলে দিলাম।

দরজা খুলতেই দেখি একটা ছেলে আর দুটো মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার হাতে আমার ব্যাগ। মেয়ে দুটোর মধ্যে একজনের হাত ছেলেটার দিকে বেশ ঝোঁকানো। তার মানে ঐ মেয়েটা ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড বা স্ত্রী হবে। দুজনের দাঁড়ানোর ধরণ দেখে মনে হচ্ছে গার্লফ্রেন্ডই হবে। ছেলেটা চুরি করেছে এই ব্যাগ। কিন্তু পাশের অন্য মেয়েটার জন্য (গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা নয়) ছেলেটা সেটা রাখতে পারে নি। তবে তাদের তিনজনের চেহারাতেই ভয়ের প্রতিচ্ছবি বেশ ভালোই ভেসে উঠেছে। এর কারণ আমি জানি!

আমি শান্ত ভঙিতে বললাম, "জ্বি বলুন!"

ছেলেটা বললো, "আমরা ভেতরে আসতে পারি?" (ছেলেটা মারাত্মক ঘামছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে বাতাস। ঘামার প্রশ্নই উঠে না!)

আমি দরজা ছেড়ে সাইডে গিয়ে বললাম, "জ্বি আসুন!"

ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড বললো (যদিও এখনো আমি নিশ্চিত নই তারপরেও আপাতত ধরে নিচ্ছি এটা ছেলেটার গার্লফ্রেন্ডই), "আমরা দুঃখিত! আসলে হয়েছে কি আপনার ব্যাগটা আমরা ভুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এটা আমাদের ব্যাগ। আমাদের ব্যাগটাও একই রঙের। আমাদের ব্যাগটা আমরা পেয়ে গিয়েছি। তাই আপনারটা ফেরত দিতে এসেছি। আমাদের মাফ করবেন! আপনাকে কষ্ট দিয়েছি এতক্ষণ!"

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপরে হঠাৎ বলে উঠলাম, "আচ্ছা সমস্যা নেই!"

ছেলেটা অনেক কষ্ট করে হাসার চেষ্টা করলো। ম্লান একটা হাসি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। তার পেছন পেছন বেশ দ্রুতগতিতেই মেয়ে দুটো এগুচ্ছে। দরজার হাতল ধরে টান দেয়ার সাথে সাথেই আমি অনেকেটা জোরেই পড়লাম, "লায়াতাসোর এত হাশায়্যার!"

সাথে সাথেই আলো নিভে গেলো আর দরজাও বন্ধ হয়ে গেলো।

তারা পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি হাসলাম। হাসি কিন্তু কয়েক ধরনের হয়, তার মাঝে এক ধরনের হাসি খুবই ভয়ানক হয়। মৃত মানুষের ঠোট ধরে হাসানোর চেষ্টা করলে তখন দেখতে পাবেন যে, চেহারায় কেমন যেনো

একটা পানসে ভাব চলে আসে। আর একইসাথে হুহু বাতাস বইতে থাকলে প্রকৃতিতেও পানসে ভাব ধরে যায়। তখন ভয়ানক লাগে সেই হাসি। আর একইসাথে কাকতালীয়ভাবে ট্রেন তখন আলোছায়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। একইসাথে বৃষ্টিও কম। কিন্তু ঝড় আসার আগ মুহূর্তে যেমন শোঁশোঁ শব্দ হয়, ঠিক তেমনটাই হচ্ছে ট্রেনের মধ্যেও। তার মাঝে আমার সেই মৃত হাসি দেখে ছেলেটা প্রায় ঘেমে নেয়ে একাকার। ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড (আমি এখনো নিশ্চিত নই) ছেলেটার হাত শক্ত করে ধরে আছে। আর অন্য মেয়েটা দরজার এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেক কষ্ট করে নিজের চিৎকার আটকে রেখেছে। কিন্তু তিনজনের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে তারা ভয়ে শুঁকিয়ে গেছে।

আমি বললাম, ‘‘বসুন!’’

তারা কোনো কথা না বলে সেভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার দিকে প্রায় কাঁদোকাঁদো চেহারা নিয়ে তাঁকিয়ে আছে।

আমি বলতে শুরু করলাম, ‘‘আপনারা ভাবছেন যে, আমি কে! আমার ব্যাগে আপনার যা দেখেছেন বা যেটার গন্ধ পেয়েছেন, সেটা কি! এছাড়াও আপনাদের মনে এখন ভিন্ন ভিন্ন হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে। আমার শুধু একটাই প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনারা! তারপর আপনাদের আমি যেতে দেবো!’’

এতক্ষণে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা (গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা নয়) প্রায় জোরেসোরেই বলে উঠলো, ‘‘সরি ভাইয়া আমরা এক্সট্রিমলি সরি! আসলে আমিই সব কিছু খুলে বলছি। আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা ট্যুরের জন্য ঢাকা থেকে সিলেট এসেছি দুদিন আগে। সিলেটে ঢোকার পর রাতের দিকে কদমতলী বাস স্টেশন ক্রস করছিলাম। কিন্তু যে সিএনজি ড্রাইভার ছিলো তিনি আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবেন বলে আর হোটেলে নিয়ে যান নি। প্রায় দু রাত পর আজকে আমরা ওদের হাত থেকে কোনোমতো বেঁচে এসেছি। কিন্তু আমাদের সাথে কাপড়চোপড় বা টাকা পয়সা কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন, আমরা খারাপ ফ্যামিলির মানুষ নই। আমরা আপনাকে ঢুকতে দেখলাম। একা কেবিনি আসতে দেখলাম। আপনার ড্রেস আর চালচলন দেখে ভাবলাম আপনি হয়তো বড়লোক ফ্যামিলির কেউ হবেন। সাধারণত একটু উচ্চপরিবারের যারা, তারা মূলত ব্যাগের মধ্যেই সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। একইসাথে আপনার দরজাও কাকতালীয়ভাবে খোলা ছিলো আর তাই আপনার ব্যাগটা আমরা চুরি করলাম। কিন্তু ব্যাগ খুলে...’’

এর মাঝে হঠাৎ করেই অন্য মেয়েটা (ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড) উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো। ছেলেটাও আর কিছুক্ষণের মধ্যে কেঁদে দেবেই বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, ‘‘কাঁদছেন কেনো?’’

গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলো। আমি পড়লাম, ‘‘লায়াতামার তান হাশায়্যার!’’

কেবিনের আলো জ্বলে উঠলো।

ছেলেটা আর তার গার্লফ্রেন্ড, তাদের হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। ছেলেটা কিছুক্ষণ পরে পরেই ঘাম মুছে যাচ্ছে। অন্য মেয়েটা চুপ হয়ে আছে। তবে হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, এই মেয়েটা ততটা ভয় পেয়ে নেই আসলে। এটা আগে কেনো খেয়াল করলাম না?

তখন মনে পড়লো যে, আমি আসলে চিয়ারলিডিং এফেক্টের মধ্যে পড়েছিলাম। চিয়ারলিডিং এফেক্ট হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে একসাথে পাঁচটা মানুষ থাকলে আর তাদের মধ্যে যেকোনো তিনজন অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ যদি সুন্দর হয়ে থাকে, তাহলে বাকিদেরও সুন্দর লাগে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমি প্রথম দুজনের দিকেই খেয়াল করেছি আর তারা দুজন ভয়ে ছিলো বলে, ঐ মেয়েটাকেও (গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা নয়) ভীত মনে হয়েছে। কিন্তু আসলে তো ঐ মেয়েটাকে ততটা ভীত বলে মনে হচ্ছে না।

আমি বললাম, “আপনারা সত্য কথা বলছেন তো?”

ঐ মেয়েটা একটু সামনে এগিয়ে এসে বললো, “জ্বি! সত্য কথাই বলছি!”

আমি মেয়েটার দিকে এতক্ষণে ভালো করে তাকালাম। গোল গোল চোখ, মেয়েটার ঠোঁটের ডান দিকে নিচ দিয়ে একটা তিল। চিবুকের একটু উপরে। মেয়েটার ঠোঁটের উপর ডানে আর বামে দুদিকেই একটু ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে হাসার সময় মেয়েটার ঠোঁটের উপরে এই জায়গায় ভাঁজ পড়ে। তারমানে মেয়েটার হাসিটা অসাধারন হবে। মেয়েটার চোখ কিছুটা সবুজাভ ধরণের। ফর্সা চেহারার এই মেয়ে ততটা শুকনো নয় আবার মোটাও নয়। বেশ সুন্দর গড়নের! টাইট জিন্স পড়ে থাকার কোমরের ভাঁজের উপর হালকা একটু শরীর দেখা যাচ্ছে।

আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে সিগারেট ধরালাম। তিনজনই আমার বিছানার সামনে রাখা ব্যাগের দিকে তাঁকিয়ে আছে। আমি মুচকি হেসে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার খুলে দিয়ে বললাম, “আচ্ছা আপনারা যেতে পারেন। তবে যেটা করেছেন সেটার জন্য শাস্তি পেতেই হবে আপনাদের! কিন্তু শাস্তি আমি দেবো না। আপনারাই আপনাদের শাস্তি দেবেন!”

তারা প্রায় বিদ্যুতের গতিতেই বের হয়ে গেলো রুম থেকে। ওই মেয়েটা (গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা না) ধীরে ধীরে পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকলো। আমি কেবিন থেকে বের হয়ে বাইরে এসে ওদের চলে যাওয়া দেখছি। গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে আর পেছনে থাকা মেয়েটা একটু সামনে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে বারবার।

আমি কেবিনে ঢুকে সিগারেট ফেলে দিলাম জানলা দিয়ে। ব্যাগ টেনে ব্যাগ থেকে বইটা বের করলাম। এই বই-ই তাদের এতটা ভুগিয়েছে। বইটা বিছানার উপর রেখে কাপড় বের করে গোসলে চলে গেলাম। বাথরুমের অবস্থা খুবই খারাপ। দেশের প্রত্যেকটা ট্রেনের বাথরুমের অবস্থাই ভয়ংকর। বাথরুমে ঢুকে দেখি বেসিনের উপরের আয়না নেই। আয়নার কেস পড়ে আছে শুধু। কেসের উপর লেখা – "এটা জনগণের সম্পদ! এর সঠিক ব্যবহার করুন।" আর এর নিচে আয়নার জায়গায় কে যেনো লিখে রেখেছে, "নিজের সম্পদ মনে করে নিয়ে গেলাম!"

এই হলো বাংলাদেশী। আমি কাপড় হোল্ডারে রেখে শাওয়ার ছাড়তেই দেখি লাল রঙয়ের পানি বের হচ্ছে। কতদিন ধরে এটা ব্যবহার হয় নি তা শুধু খোদাই জানে। আমি অপেক্ষা করছি রঙ ঠিক হওয়ার জন্য। শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতেই খেয়াল হলো আমি আবারো কেবিনের দরজার না আটকে গোসলে চলে এসেছি। ভাবলাম কিছুই হবে না। গোসল শেষ করে টাওয়ালটা বেঁধে বাথরুম থেকে বের হতেই দেখি ঐ মেয়েটা (গার্লফ্রেন্ড মেয়েটা নয়) আমার বিছানার এক কোনায় বসে আছে।

মেয়েটা ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে বিছানায় রাখা বইটার দিকে। আমি শুরুতে কিছুটা থমকে গিয়েছিলাম, যদিও যতটা সম্ভব চেহারায় সেই ভাব লুকিয়ে রেখে গলা ঝাড়লাম। মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়েই আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, "শরীরে কাপড় দিন!"

আমি সাদা শার্টটা পড়তে পড়তে বললাম, "আপনি এখানে? আরো কিছু বলার ছিলো?"

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বললোম "এখনো অভিনয় করছেন?"

আমি একটু থমকে গিয়ে বললাম, "কিসের অভিনয়?"

মেয়েটা বললো, "আপনি আমাকে আসলেই চিনতে পারেন নি?"

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। প্যান্ট পড়তে পড়তে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনার নাম কী? আপনি কে?"

মেয়েটা হাসলো। মেয়েটার ঠোঁট তখন ভালোভাবে খেয়াল করি নি, এখন খেয়াল করছি। লাল লিপস্টিক দেয়া ঠোঁট আর হাসির সাথে ভেসে ওঠা ভাঁজ মেয়েটাকে অসাধারণ রূপবতী বানিয়ে দিয়েছে। জানেন কি, একটা ছেলে যদি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমের প্রস্তাব বারবার ফিরিয়ে দেয় তাহলে সেই মেয়েটার উচিত ছেলেটার সামনে গিয়ে হাসার চেষ্টা করা। মেয়েটার হাসিটা যদি সুন্দর হয় তাহলে ছেলেটা আর কোনভাবেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। একটা ছেলেকে ঘায়েল করার জন্য একটা মেয়ের গায়ের রঙয়ের চাইতে সুন্দর হাসি অনেক বেশি কাজ করে।

উদাহরণ হিসেবে আমাকেই ধরতে পারেন। আমি এখন পর্যন্ত অনেক মেয়ের সাথেই রাত কাটিয়েছি। কিন্তু কোনো মেয়ের হাসিই আমাকে একেবারে ভেতর পর্যন্ত আঘাত করে নি। এই মেয়েটার সুন্দর হাসিটা আমাকে যতটা না আঘাত করেছে। মেয়েটার হাসিটা দেখার পর আমি প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিলো এই হাসি আমি এর আগেও কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়?

মেয়েটা উঠে সিগারেট হাতে নিলো। আমি সিগারেট ধরাতে যাওয়ার আগেই মেয়েটা তার জিন্সের পকেট থেকে লাইটার বের করে আমার ঠোঁটের সামনে ধরলো। আমি অনেক চেষ্টা করেও অবাক হয়ে যাওয়াটা আটকাতে পারলাম না। মেয়েটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা কাছে। আমি মেয়েটার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি। মেয়েটাকে অনেক পরিচিত মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু তারপরেও মনে করতে পারছি না!

মেয়েটা আমাকে চেনে সেটা স্পষ্টভাবেই মেয়েটার কথা বার্তায় বোঝা যাচ্ছে। আর মেয়েটার কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছেনা সে আমার পরিবারের কেউ হবে মানে চাচাতো বা মামাতো বোন টাইপের কিছু হবে! কিন্তু তারপরেও মেয়েটার ঘ্রাণ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। মেয়েটা পাঁচ ফুট চার অথবা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হবে।

একটা জিনিস জানেন কি? প্রত্যেক মেয়ে আর ছেলের শরীরে আলাদা একটা ঘ্রাণ থাকে। তবে সেটা সে নিজে পায় না। তার আশেপাশে থাকা সবাই সেটা পায়। সেই ঘ্রাণ দিয়েই একটা মেয়েকে অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করা যায়।

আমি সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটার থেকে দূরে গিয়ে বিছানায় বসলাম। পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য বইটা খুলতেই সারা কেবিনে সেকেন্ডের মধ্যেই মরা মানুষ গন্ধ ভেসে উঠলো!

মেয়েটা নাকে হাত দিয়ে আমাকে বললো, “তুমি এখনো এই বইটা নিয়ে ঘুরছো?”

আমি কিছুটা চমকে গিয়ে মেয়েটাকে বললাম, “দেখুন, আপনাকে আমি চিনতে পারছি না। দয়া করে নামধাম কিছু বলুন, যদি থাকে আর কি!”

মেয়েটা মুচকি হেসে আমার পাশে বসলো। আমি বললাম, “এখন বলুন!” মেয়েটা বললো, “আমি পরী!”

আমি এতটাই চমকে গেলাম যে, মেয়েটা আমার চেহারা দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, “বাহ! তুমি চমকাতেও পারো? জানতাম না তো!”

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। মেয়েটা বিছানায় শুয়ে পড়লো। আধশোয়া হয়ে একা একা হাসছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি! আমার মাথায় প্রায় বাজ ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আসলে। এই মেয়েটা পরী হতেই পারে না। পরীর চেহারা এমন হতেই পারে না। কিন্তু তারপরেও পরীর ঘ্রাণ আর পরীর মতো সবকিছুই! চাউনি থেকে শুরু করে ঠোঁটের হাসিটা পর্যন্ত, সবকিছুই!

যারা ঘটনা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন বা যারা বুঝতেই পারছেন না আসলে কে পরী বা কোথা থেকে এই পরীটা আসলো, তাদের বলছি –

আমার সাথে পরী মেয়েটার প্রথম কথা হয়েছে ফেসবুকে। সেদিনগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে আমার। চোখের সামনে ভাসছে। সেদিন কোনোরকমে সকালের আলো ফুটতেই বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি একটা হাসি দিয়েছিলাম। সূর্যের আলো পানির ফোঁটার মতো আমার গাল বেয়ে পড়ছিলো। পরীর সাথে সেদিন আমার সকাল ১১ টায় দেখা করার কথা ছিলো। পরীর সাথে যে কথাগুলো শুরুতে হয়েছিলো সেগুলো আমার মাথায় তখন ঘুরছিলো। পরিচয় ফেসবুকেই হয় আমাদের। পরীকে যখন প্রথম দেখে ছিলাম, তখনই তার প্রেমে পড়ে যাই আমি। মেয়েটার গোল গোল চোখ সবার আগে আমার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো এই হাসি দেখেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবো। চোখের দিকে তাকানোর পরে এক ধরণের মায়া অনুভব করেছিলাম। এত সুন্দর চোখের রূপবতী পরীকে, প্রথমবার আমিই টেক্সট দিয়ে ছিলাম।

– চিনতে চাই!

– দুঃখিত, আমার মন খারাপ। আমি কথা বলতে চাচ্ছি না এখন!

– উম্মম্মম্ম··· আচ্ছা! ভালো থাকবেন!

এর ঠিক তিন দিন পরেই আমি ফেসবুকে ঢুকে একটা মেসেজ দেখি, পরীর।

– আপনি কি জানি বলতে চেয়েছিলেন?

– ভালো আছেন?

– জ্বি! আপনি?

– ভালো! মন ঠিক আছে এখন?

– জ্বি, ঠিক আছে।

পরীর সাথে কথা বলতে বলতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

তারপর প্রত্যেক মুহূর্তের খুনসুটির পর, হাজার রঙের কথা বার্তার পর আর অনেকগুলো হাসির পর আমি পরীকে আমার মনের কথা জানিয়ে বসলাম!

– পরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি!

– আমার মাত্রই ব্রেকআপ হয়েছে। তিন বছরের সম্পর্ক! এখনই অন্য আরেকটা সম্পর্কে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার নেই! আমাকে ভাবতে দাও!

– আচ্ছা, ভাবো। যত সময় নেয়ার ইচ্ছে হয়, নাও! তারপরেও উত্তর দিও।

পরীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বাসে। পরী বাড়িতে যাচ্ছিলো। সে আমাকে বলেছিলো তাকে যেনো বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই আমি। আমি দু ঘন্টার সেই জার্নি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। বাসে আমি আর পরী, পাশাপাশি বসেছিলাম। আমি অবাক হয়ে পরীর দিকে তাকাচ্ছিলাম। সেই জার্নিতে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেছিলাম। পরীই প্রথম আমার হাত ধরেছিলো। আমি সেই হাত কোনোদিনই ছাড়তে চাই নি।

আমি যখন পরীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরছিলাম, তখন আমি প্রায় কেঁদেই দিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আর কোনোদিনও হয়তো পরীর সাথে আমার কথা হবে না, দেখা হবে না, আর কোনোদিনও এই নারীকে আমার আর পাওয়া হবে না। বাসায় ফিরে আমি কিছুতেই পরীর কথা আর মাথা থেকে সরাতে পারছিলাম না। কিছুতেই না। বারবার চেষ্টা করছিলাম, হাজার বার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পরীর প্রতি আমার অনুভূতিকে আমি দমাতে পারছিলাম না।

পরীর সাথে আমার সম্পর্ক যখন তিন বছরের কাছাকাছি। তখনও আমি পরীকে সেই আগের মতোই ভালোবাসতাম। আসলে আগের মতো বললে ভুল হবে, আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। অনেক বেশি ভালোবাসতাম। পরীর সাথে আমার এই তিন বছরে প্রায় শ'য়ের কাছাকাছিবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিলো। অন্য মেয়েদের সাথে শারীরিক সম্পর্কের পরে আমি যেভাবে বাকিদের ভুলে গিয়েছিলাম, সেভাবে পরীকে ভুলতে পারছিলাম না। আমি প্রথম এক

বছরে অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম, পরীকে ভুলে যেতে। কিন্তু যতবারই ভেবেছি পরীকে ভুলে যাবো ততবারই বাতাসে পরীর ঘ্রাণ পেতাম। এখনো পাই।

আগেও বলেছি, আবারো বলছি। মেয়েদের শরীরের এক ধরণের ঘ্রাণ থাকে, ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতোই প্রত্যেক মেয়ের শরীরের ঘ্রাণ আলাদা। মায়ের শরীরের ঘ্রাণ এক রকম আবার স্ত্রীর শরীরের ঘ্রাণ অন্যরকম। একইভাবে প্রত্যেক ছেলের শরীরেও তাদের নিজস্ব ঘ্রাণ রয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে, মেয়েদের বা ছেলেদের শরীরের ঘ্রাণ তারা নিজেরা পায় না। একটা মেয়েই বা ছেলেই কেবল আরেকটা ছেলের বা মেয়ের শরীরের ঘ্রাণ পায়। এই ঘ্রাণ দিয়েই আপনি আপনার প্রিয় মানুষদের আলাদা করতে পারবেন।

যাই হোক! তো তিন বছরের বেশি সময় ধরে আমার আর পরীর মাঝে সম্পর্ক চলছিলো। পরী শুরুতেই জানতো যে আমি ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, আমি মুসলমান নই। কিন্তু তারপরেও সে মেনে নিয়েছিলো, সম্পর্ক করেছিলো। কিন্তু একটা ঘটনার পর থেকেই পরী বারবার আমাকে এসব জাদুবিদ্যা ছেড়ে দেয়ার জন্যে জোর করতে শুরু করেছিলো, প্রত্যেক ধাপে ধাপেই খোঁটা দিতে আরম্ভ করেছিলো।

পরীর একবার জ্বর হয়েছিলো। একশ চার ছাড়িয়ে যায় জ্বরে। পরী উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করে। সেদিন রাতে পরীর বাসার সামনে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, শুধুমাত্র একবার পরীকে দেখার জন্য। পরীর এই অবস্থায় আমি বারবার তাকে দেখতে চেয়েছিলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। শেষমেষ অনেক ভেবেচিন্তে পরীর বাসায়ই চলে গিয়েছিলাম আমি। অনেক ঘটনা ঘটিয়ে দেখে এসেছিলাম তাকে।

ডাক্তারকে বলতে শুনেছিলাম যে, পরীর জ্বর নাকি আরো বাড়বে। সাধারণত ১০৪ থেকে ১০৬ ডিগ্রি জ্বরে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু ১০৮ ডিগ্রি কিংবা এর বেশি হয়ে গেলে জ্বরের কারণেই মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আর আমি যেটা ভয় পেয়েছিলাম, সেটাই হয়েছিলো সেদিন। জ্বর সেদিন রাতের মধ্যেই ১০৬ ডিগ্রির উপরে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছিলাম। আমি জানতাম না যে আমি কি করতে চলেছিলাম। আমি সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি ঠিক করেছিলাম সবচেয়ে কঠিন মন্ত্রটা দিয়ে পরীকে সারিয়ে তুলবো। কিন্তু এর জন্যে যে আমাকেও মারা যেতে হতে পারে, এটাও আমি জানতাম।

আমি সেই ঘটনার আগে কোনোদিনও ব্ল্যাক ম্যাজিকে রক্তের ব্যবহার করি নি। আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিকের বিশেষ কিছু মন্ত্র ও উদ্দেশ্য ছাড়া রক্তের ব্যবহার করতে হয় না। আমি যখন ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখছিলাম, এসব নিয়ে গবেষণা করছিলাম; তখন এক রাতে, প্রায় না জেনেই আমি কিছু শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। সেগুলো ছিলো এনোখিয়ান ভাষায় লেখা। এনোখিয়ান ভাষাকে মূলত স্যাটানিস্টদের ভাষা বলে আখ্যায়িত করা যায়। স্যাটানিজমে সবচেয়ে বেশি মন্ত্র এনোখিয়ান আর অ্যারামায়িক ভাষায় লেখা হয়েছে। যদিও আরো অনেক ভাষাতেই মন্ত্র লেখা হয়, যেমন – সংস্কৃত, হিব্রু, ইড্ডিশ, ল্যাটিন ইত্যাদি।

৬ বছর আগের সেই রাত এখনো আমার কাছে স্পষ্ট। আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে পরেই কানের কাছে এসে কে যেনো ফিসফিস করতে শুরু করেছিলো আমার। প্রথম কয়েকবার মশা ভেবে তাড়িয়ে দিলেও পরে চোখ খুলে দেখেছিলাম এক ডেমনকে, আমার বিছানার পাশের সোফাতে বসে থাকতে। যদিও এর আগেও অনেকবার ডেমন দেখেছিলাম আমি তবে কোনোবারই ভয় পাই নি। কিন্তু সেবার আমার শরীর কাঁপিয়ে জ্বর চলে এসেছিলো। রাতে বেশ কয়েকবার বমিও করেছিলাম।

তারপরে একসময় আমি সেই ফিসফিসের আসল কারণ বুঝতে পেরে অনেক কষ্টে বিছানা থেকে উঠে আমার প্যান্টের পকেট থেকে সেই নোটবুক বের করে সেই ফিসফিস করা শব্দগুলোর মানে খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু যতক্ষণে সেই শব্দগুলোর মানে খুঁজে পেয়েছিলাম তার মধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিলো। কোনোরকমে দৌড়ে আমার রুমে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছিলাম।

সেদিনই নরকের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ডেমন স্বয়ং শয়তানের সাথে কথা বলেছিলাম আমি। সেদিন আমার পিঠের নিচের দিকে আবিষ্কার করেছিলাম 'লুসিফারিয়ান সিল'। লুসিফারিয়ান সিলকে স্যাটানিজমে 'দ্যা সিল অফ বন্ডিং' হিসেবে ধারণা করা হয়। এই সিল যার শরীরে সঠিক নিয়মে এঁকে দেয়া হবে আর একইসাথে বন্ডিং স্পেল পড়া হবে, তার আত্মা স্বয়ং শয়তানের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। যেটাকে অন্য ভাষায় বলে, শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি।

আমি সেদিনের পর থেকেই কার্সড। সেদিনের পর একটানা বারোদিন ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুম ভাঙার পর পরী সুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আর আমিও সেদিন মারা যাই নি। মারা গেলে এই ঘটনা আপনাদের কেউ শোনাতো না। তাই না?

পরীর জন্য সেই স্পেল ব্যবহার করার পর থেকেই পরী আমাকে আরো ভালোভাবে দোষারূপ করতে শুরু করেছিলো। পরী সেদিনের পর চলে গিয়েছিলো আমাকে ছেড়ে। আমি হাজারবার চেষ্টা করেও তাকে ধরে রাখতে পারি নি। আর তারপর পরীকে শেষ দেখেছিলাম সিলেটেই, একটা রেস্টুরেন্টে। আমি সেখানে প্রায়ই কফি পান করতে যাই। পরীর সাথে যে টেবিলে গিয়ে আমি বসতাম সেখানে সে আরেকজনের হাত ধরে বসে আছে। আমি হাসলাম। ঘুরে অন্য টেবিলে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর পরী উঠে আসলো।

আমার সামনে বসে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছো?"

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়লাম।

পরীর ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। পরী মুচকি হাসছে। সে বুঝতে পারছে যে, আমি তার ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমি তার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত হয়ে গেলাম।

নিচের দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলেটা তোমার বয়ফ্রেন্ড?"

পরী বললো, "না। আমার হাজবেন্ড!"

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে আছি।

পরী বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে। ভালো থাকো।"

পরী ঘুরে চলে গেলো। আমি সেই রেস্টুরেন্টে আর থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে পড়লাম। নিচ থেকে জানলা দিয়ে উপরে তাকালাম। পরীও নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

না আমি কিছু বলার ক্ষমতা রাখি, না সে কিছু বলার অধিকার রাখে। দুজন এখন দু পথে। আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। তারপরে সেদিনই শুনেছি পরী নাকি রাস্তা পার হওয়ার সময় এক্সিডেন্ট করেছিলো। সবসময় তার হাত ধরে রাস্তা পার করাতাম। সম্পূর্ণ ফাঁকা রাস্তাতেও তাকে একা ছাড়তাম না। কারণ সে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিলো। যেটাকে আমি বারবার ভেঙে বারবার কাঁদি।

পরী এক্সিডেন্ট করলো। মেডিক্যালে যাওয়ার আগেই সে মারা গেলো। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম মর্গে। তার ঠোঁট তখনও গোলাপি হয়ে আছে। তার চেহারায় তখনও সেই মায়া, সেই ভালোবাসা, সেই সৌন্দর্য! আমি তার কপালে চুমু খেয়ে বের হয়ে আসলাম। তারপর থেকে তাকে আর দেখি নি আমি। তাকে মনে পড়েছে, মনে পড়েও বারবার। কিন্তু দেখি নি আর, কোনোদিনও।

আমার কেবিনের বিছানায় শুয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছি। মেয়েটা আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেনো পরী আমার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে। পরীর স্পিরিট মেয়েটার মধ্যে পোসেসড হয়েছে এটা তো স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে। কারণ পরীর বেঁচে ফিরে আসার কথা নয় এমনকি চেহারা চেঞ্জ করেও ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আর তাই, একমাত্র একটাই উপায় আছে আর সেটা হচ্ছে পরীর ডেমন মেয়েটার উপর পোসেসড হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পরীর স্পিরিট মেয়েটাকে মেরে ফেলবে ধীরে ধীরে! তার কারণ হচ্ছে, স্পিরিট বা ডেমনিক পোসেশনে যে মানুষটা হোস্ট হিসেবে কাজ করে মানে যার উপর স্পিরিট পোসেসড হয়, সেই মানুষটা ধীরে ধীরে শুঁকিয়ে যেতে থাকবে ও স্পিরিট বা ডেমন যত বেশি হোস্টের ভেতরে যেতে থাকবে তত দ্রুতই হোস্ট মারা যাবে। এর কারণ হচ্ছে, স্পিরিট বা ডেমন মূলত হোস্টের শরীরের পজিটিভ ও নেগেটিভ দু ধরনের শক্তিই শুষে নিতে শুরু করে। আর সেজন্যেই হোস্টের বাঁচার আশা শূন্যতে চলে আসে।

আমি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, "পরী!"

মেয়েটা আমার দিকে তাকালো, অবাক চোখে! তারপরেই মুচকি হেসে বললো, "বলো আয়ান!"

মেয়েটা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলো। আমি তার সামনে গিয়ে পা গেড়ে বসলাম। তার হাতে হাত রেখে তাকে বললাম, "তুমি পরী নও আমি জানি। কিন্তু তোমার ভেতরে পরী লুকিয়ে আছে। আমি দুঃখিত! আমাকে এটা করতেই হবে! শুধু জেনে রেখো যে, অনেক ভালোবাসি তোমাকে।"

মেয়েটা কিছু বুঝে উঠার আগেই আমি পকেট থেকে স্যাটানিক অ্যামুলেট বের করে তার কপালের সাথে লাগিয়ে চাপ দিয়ে ধরলাম। সে চিৎকার করছে। আমি এক হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলাম। মেয়েটার চোখ জ্বলছে। আমি মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার উপরে উঠে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পড়লাম, "উত সারভো স্যাটানাস এনাইমা তুয়া!"

মেয়েটা আরো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমার হাতের তালুতে তার দাঁত এসে লাগলো। হঠাৎ করেই মেয়েটা চুপ হয়ে গেলো। আমি মেয়েটার উপর থেকে সরে বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

আমার শার্ট ঘামে ভিজে গেছে। শার্টের বোতামগুলো খুলতেই মেয়েটা বিছানা থেকে উঠে বসলো।

আমি সিগারেট ধরালাম। মেয়েটাকে পানির বোতল এগিয়ে দিলাম। মেয়েটা নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। আমি মেয়েটাকে বললাম, "আপনি এখানে রেস্ট নিন। আমি গোসল করে আসছি। আপনার সাথে আমার কথা আছে।"

শার্টটা খুলতেই কেবিনের দরজায় ধাক্কা পড়লো। মেয়েটা ভীত চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আমি কোনো কিছু না পড়েই দরজাটা খুলে দিলাম। একটা লোক আর একটা পুলিশ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের দিকে তাকিয়ে পুলিশ ভাইজান জিজ্ঞেস করলো, "কি চলছে ভেতরে?"

আমি বললাম, "আমি আর আমার স্ত্রী চট্টগ্রাম যাচ্ছি। কেনো কিছু হয়েছে কি?"

উনি বললেন, "আশেপাশের মানুষ নাকি এই কেবিন থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনেছেন! কি করছিলেন আপনারা?"

আমি বললাম, "আমরা স্বামী স্ত্রী কেবিনে করে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। যা ইচ্ছে করতে পারি। তাতে আপনাদের কী? কারো সমস্যা হলে সেটার জন্য দুঃখিত। আর হবে না।"

পুলিশ ভাইজান আমার দিকে এবার ঝুঁকে এসে বললেন, "আসলেই বউ আপনার? নাকি কোথাও থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন!"

যতটা ঝুঁকে এসেছিলেন, বোঝা গিয়েছিলো তিনি একেবারে আস্তে কথা বলবেন। কিন্তু দেখতে হবে না কে কথা বলছে!

প্রত্যেকেই হাসছে। মেয়েটা বিছানায় বসে ছিলো। সে শুনতে পেয়েছে কথাটা। আমি পুলিশকে বললাম, "আপনাকে আমি আমাদের কাবিনের কাগজপত্র দেখাচ্ছি। কিন্তু যে ব্যবহারটা করেছেন সেটার জন্য আপনার নামে আমি মানহানির মামলা করতে পারবো। আর করবোও! সিলেট ফিরে আসি! আপনার নামটা যেনো কি? ওহ আচ্ছা, নাহিদ?! বাহ! আপনার সাথে আমার তাহলে কোতোয়ালিতেই দেখা হচ্ছে। কেমন?"

পুলিশেরা যখন ভয় পেয়ে যায় তখন কিন্তু তাদের শুধু গলা শুকাঁয় না। তাদের পুরোটা চেহারাই আমসে বর্ণ ধারণ করে। আমি ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে পুলিশের সামনে ধরলাম। সে সেটা দেখলো।

আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যার সরি স্যার। আর হবে না এমন। প্লিজ আপনি এমন কিছু করবেন না। আমার চাকরি চলে যাবে।"

আমি বললাম, "আমার স্ত্রীর কিছু বন্ধু আছে এই ট্রেনে। তাদের খুঁজে বের করে নিয়ে আসেন।"

পুলিশ বললো, "কিন্তু স্যার এত মানুষের মধ্যে কীভাবে খুঁজে পাবো?"

আমি বললাম, "আমি জানি না!"

বলেই ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

মেয়েটাকে বললাম, "আপনার বন্ধুরা এখানে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি গোসল করে আসছি। আপনি তারপরে আমাকে সবকিছু খুলে বলবেন! আর রুম থেকে বের হবেন না।"

আমি বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় মেয়েটা বললো, "আপনি কীভাবে ওটা করলেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোনটা?"

মেয়েটা বললো, "ঐ যে কাবিন দেখালেন কীভাবে?"

আমি হেসে মেয়েটাকে বললাম, "ব্যাগের উপর কাগজটা আছে। যা দেখতে চান সেটার কথা ভেবে কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকুন।"

বলেই বাথরুমে ঢুকে গেলাম।

গোসল করে বাইরে আসতেই দেখি মেয়েটা আমার ব্যাগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। কাগজটা হাতে নিয়ে। মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো, "এটা কি? এটা কিসের কাগজ? যা দেখতে চাচ্ছি তাই-ই তো দেখাচ্ছে।"

আমি শার্ট গায়ে দিতে দিতে বললাম, ‘‘এক ধরনের মন্ত্র আছে, যেটাকে বলে উইশ স্পেল। এই ধরণের মন্ত্র পড়ে সেটা যেকোনো বস্তুতে কাস্ট করলে সেই বস্তু আপনার ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হয়ে যায়। কাগজে সেটাই পড়া আছে। ট্র্যাভেল করছি, কাজে লাগতে পারে ভেবে আগেই রেখে দিয়েছিলাম।’’

মেয়েটা হা হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি হাসলাম। মেয়েটাকে বললাম, ‘‘এখন বলা শুরু করুন’’।

মেয়েটা বলতে শুরু করলো, ‘‘আমরা আপনার ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু আমরা সেটা খুলেও দেখেছি। সেখানে একটা বই আর কাপড়চোপড়ের পাশাপাশি কিছু জিনিসপত্রও ছিলো। আমরা যখন ব্যাগটা খুলি তখন বইটা দেখেই মূলত আমরা ভয়ে ব্যাগটা ফেরত দিতে আসি। কিন্তু আপনার ব্যাগে এত জিনিস দেখে একটা জিনিস আমি লুকিয়ে ফেলি। আসলে আমি প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থী। আর সেজন্য আমার এসবের উপর বেশ আগ্রহ। এই প্রথম কারো কাছে আমি এই ধরনের একটা বাক্স দেখতে পাই। বাক্সটার ভেতরে কি আছে সেটা জানার জন্য আমার ভেতরে ছটফট করছিলো। খুলতে পারছিলাম না। শেষে বাক্সটা নিয়ে বাথরুমে গেলাম। আর তারপরে বাক্সটা যখন খুলি তখন আমার হাত থেকে বাক্সটা পড়ে যায় আর হঠাৎ করে দেখি বাথরুমে ধোঁয়া। আর তারপরে ধোঁয়াটা আমার চোখ মুখ দিয়ে ঢুকে গেলো। আর নিজেকে কেমন যেনো মনে হচ্ছিলো। আমি কথা বলছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছিলো আসলে আমি কথা বলছি না, আমি আমার শরীরের ভেতরে আটকে আছি আর আমার শরীরের বাইরে থেকে আরেকজন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর তারপরেই আমি আপনার কাছে চলে আসলাম। আপনি যা যা করছিলেন আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম, সবই বুঝতে পারছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না।’’

আমি সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘আমি বাকিটুকু জানি! আপনার নামটা কী?’’

মেয়েটা কপাল কুঁচকে বললো, ‘‘নাদিয়া!’’

আমি বললাম, ‘‘আপনারা যে কাহিনী আগে বলেছেন সেগুলো সত্য তা আপনার তখনকার কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পেরেছি। আপনার বন্ধুরা কোথায়?’’

এই কথা বলতে না বলতেই দরজায় ধাক্কা পড়লো। সেই পুলিশ সাহেব নাদিয়ার বন্ধুদের নিয়ে এসেছে। তারা এসে নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরলো। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করার জন্য আমি পুলিশের কাছে গিয়ে বললাম, ‘‘ধন্যবাদ!’’

বলেই দরজা লাগিয়ে দিলাম। ছেলেটা আর মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সিগারেটে টান দিয়ে তাদের সামনের বিছানায় বসলাম। একটু জোরেই বললাম, "আপনারা বসুন। আপনাদের সাথে আমার কথা আছে।"

ছেলেটা এবার আমাকে ধমকানোর জন্য এগিয়ে আসছে। আমি সাথে সাথেই পড়লাম, "টেরি ইকিয়ি তিসইয়ি ন্রান!" ছেলেটা ছিটকে গিয়ে সেই বিছানায় বসে পড়লো। মেয়েটা আমার দিকে ভয়ংকর চোখে তাকাচ্ছে। নাদিয়ার চোখে মুখে হালকা একটু হাসির ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি বললাম, "আপনাদের নাম বলবেন প্রথমে। তারপরে একজন একজন করে কথা হবে! আর যেহেতু ব্যাগ খুলেছেন আর যা আছে তা দেখেছেন, সেহেতু আপনারা পুরো ঘটনা শুনতে চাইছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। আমি পুরো ঘটনাই শোনাবো।"

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে তার নাম বললো, "তানভির!" আর সাথে সাথেই মেয়েটা বললো, "আমি তৃষা!"

আমি পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, "চা খাবেন কেউ? কিংবা নাস্তা করবেন কেউ?"

তারা নাসূচক মাথা নাড়লো।

কিন্তু নাদিয়া বললো, "আমি খাবো। খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

আমি তানভিরকে বললাম, "আপনি বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসুন। আপনাদের জন্যেও নিয়ে আসবেন। ভারী খাবার আনবেন না ততটা। এখনো রাত অনেক বাকি!"

ছেলেটার হাতে হাজার টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিলাম। ছেলেটা ভীত চোখে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেলো। আমি পড়লাম, "এত হাশায়্যার"। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

আমি যতবার মন্ত্র পড়ছি তৃষা মেয়েটা হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। একইসাথে ভয় আর জানার আগ্রহ মেয়েটাকে ধরেছে। বেশ ভালোভাবেই। আর নাদিয়া মেয়েটা এখন মজা পেতে শুরু করেছে। যতবার আমি মন্ত্র পড়ছি, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। আমার পেরিফেরাল ভিশন ভালো বলে সেটা সহজেই খেয়াল করতে পারছি।

আমি তৃষার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনি বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতে পারেন। আপনার সাথে কিছু কথা আছে।"

তৃষা মেয়েটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে চলে গেলো বাথরুমে। আমি নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি অনেকটা পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছেন?"

নাদিয়া বেশ সহজেই উত্তর দিলো, "ভালো আছি। আপনি? আচ্ছা আপনার নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি! আপনার নামটা কী বলা যাবে? অবশ্য আপনি বলতে না চাইলে বলবেন না! সমস্যা নেই!"

এটা বলেই নাদিয়া কপাল কুঁচকে নিচের দিকে তাকালো। এর মানে হচ্ছে, সে আমার নাম শুনতে চায়। আমি যদি না বলি তাহলে সে সহজেই রাগ করবে।

আমি বললাম, "আমি আয়ান! সিলেটেই থাকি। এখন চিটাগাং যাচ্ছি। আপনি?"

নাদিয়া মাথা উঠিয়ে বেশ হেসে বললো, "আমি ঢাকা থাকি। গুলশানে। পরীক্ষা শেষ করে সিলেট ঘুরতে এসেছি কিন্তু সিলেটে এসেই তো এই ঘটনা ঘটলো। অবশ্য না ঘটলে এতকিছু জানতে পারতাম না।"

মেয়েটা প্রায় ইনডিরেক্টলি ফ্লার্ট করছে এটা আমি নিশ্চিত। শুধু কথা দিয়েই নয়। মেয়েটার চোখ, মুখ সবকিছুই আমার সাথে এখন ফ্লার্ট করছে।

আমি বললাম, "তো আপনি বলছিলেন আপনি প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থী, তাই তো? পড়াশোনা কেমন চলে? কোথায় পড়ছেন?"

নাদিয়া বললো, "আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছি। থার্ড ইয়ারে। আপনি কি পড়ছেন? নাকি অন্যকিছু করছেন? দেখে তো পড়ছেন বলে মনে হয় না!"

একথা বলেই হেসে দিলো নাদিয়া! মেয়েটার হাসিটা খারাপ না। অন্য দশটা মেয়ের থেকে তো অনেক ভালো!

আমি বললাম, "জ্বি না। আমি অস্ট্রেলিয়া আছি। সেখানে আমার নিজস্ব আইটি অর্গানাইজেশন আছে। দেশে এসেছি একটা কাজের জন্য। সিলেটে প্রায়ই আসা যাওয়া হয়। চিটাগাং যাচ্ছিও সেই কাজের জন্য।"

নাদিয়া কিছু বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু তৃষা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলো। তৃষা মেয়েটা শ্যামলা কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো খুব সুন্দর। এমন চোখকে আমি পাথরের চোখ বলে থাকি। আমাকে একবার একটা মেয়ে বলেছিলো যে, আমার চোখ নাকি পাথরের মতো।

তৃষা বেরিয়ে সাথে সাথেই বললো, "ভাইয়া আমার প্রচন্ড ক্ষিধে লেগেছে।"

আমি এজন্যেই তাকে বাথরুমে পাঠিয়েছি। একটা মেয়েকে বা অপরিচিত কাউকে নিজের বাথরুম ব্যবহার করতে দিলে সে আপনার অনেক কাছের মনে করে নিজেকে। এটা স্বাভাবিক।

আমি বললাম, "তানভির ভাই আসুক। তারপরে খাওয়া যাবে।"

বলতে না বলতেই দরজায় ধাক্কা পড়লো। এই নিয়ে আজকে দুবার কো-ইনসিডেন্সের মুখে পড়লাম। আমি হাসলাম।

দরজা খুলে দিলাম। তানভির দাঁড়িয়ে আছে। উনি এখনো ভয় পেয়ে আছেন।

আমরা খাওয়াদাওয়া করলাম। খাওয়াদাওয়ার পর আমি তাদের আমার সম্পর্কে সব খুলে বললাম। তানভির বললো, "আপনি সায়েন্সের একজন শিক্ষার্থী হয়ে এসব প্যারানরমালে কিভাবে যুক্ত হলেন?"

আমি হেসে বললাম, "আপনি তো আল্লাহতে বিশ্বাস করেন তাই না?"

তানভির উত্তর দিলো, "হ্যাঁ!"

আমি বললাম, "আপনি না দেখে আল্লাহতে বিশ্বাস করছেন কীভাবে? আপনিও তো সায়েন্সের শিক্ষার্থী। সায়েন্স আপনাকে ইশ্বরের প্রমাণ দিতে পারবে ঠিকই কিন্তু কে সঠিক ইশ্বর সেটার প্রমাণ দিতে পারবে? বা ইশ্বরকে দেখাতে পারবে?"

তানভির বললো, "না কিন্তু সায়েন্স আমাকে ইশ্বরের প্রমাণ দিচ্ছে। আর তাই বিশ্বাস করছি।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। সায়েন্স যখন সুপারন্যাচারাল কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারছে তখন প্যারানরমালেও তো বিশ্বাস করা উচিত। কারণ প্যারানরমালও তো সুপারন্যাচারাল।"

তানভির বললো, "ওহ আচ্ছা। হ্যাঁ! এটা ঠিকই। কিন্তু আমি হাদিসে বিশ্বাস করতে পারি না।"

আমি বললাম, "সেটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি তো মুসলিমই নই। তাতে কি? মানুষকে দেখি তার নিজের ধর্ম বাদে বাকি ধর্মের মানুষকে মানুষ হিসেবে মনে করে না। এটা তার নিজস্ব মত। এতে কারো কিছু আসে যায় না। বিশ্বাস, ভালোবাসা, সুখ, সত্য, মিথ্য এসবই আপেক্ষিক। এগুলো আপনার কাছে একটা অর্থ নিয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু অন্যের কাছে অন্য অর্থ হিসেবেও দেখা দিতে পারে।"

নাদিয়া আর তৃষা চুপচাপ শুনছিলো। তৃষা বললো, "আপনি চিটাগাং কেনো যাচ্ছেন?"

আমি মুচকি হেসে বললাম, ‘‘আছে কোনো একটা কারণ!’’

নাদিয়া বললো, ‘‘আপনাকে চেনা চেনা লাগছিলো শুরু থেকে। আপনাকে কি আমি কোথাও দেখেছি?’’

আমি জোরে হেসে উঠলাম। জ্বি দেখেছেন। ট্রেনে উঠার সময় হয়তো দেখেছেন।

তানভির আর তৃষা হাসছে।

নাদিয়া বললো, ‘‘আরে না! আগে কোথাও দেখেছি কি-না সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম!’’

আমি বললাম, ‘‘কি জানি! আপনি দেখেছেন কি-না সেটা আমি কিভাবে বলবো!’’

নাদিয়া ভাবছে। আসলেই সে আমাকে কোথাও দেখেছে কি-না!

এভাবে প্রায় রাত বারোটার বেশি সময় ধরে আমরা কথা বলেছি। তানভির আর আমি কেবিনের বাইরে গেলাম। আমি সিগারেট ধরাতেই তানভির বললো, “আপনার কাছে আরেকটা সিগারেট হবে?”

আমি সিগারেটের প্যাকেট উনার হাতে দিলাম। উনি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, “আপনি আসলেই এটা করবেন?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ! এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আর!”

তানভিরের হাত কাঁপছে। সে ভয় পেতে শুরু করেছে আরো বেশি। কারণ সে জানে কি হতে চলেছে।

আমি তানভিরের কাঁধে হাত রেখে মৃত হাসি দিয়ে বললাম, “তোমাকে যেটা করতে বলেছি, সেটা তুমি করেছো। তোমার তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। নাকি কিছু ভুল করেছো?”

তানভির নাসূচক মাথা নাড়লো। সে কেবিনে ঢুকে গেলো।

আমিও পেছন পেছন কেবিনে ঢুকলাম। তারা তিনজনই গল্প করছে। তানভিরের চোখে আমার জন্য ঘৃণা ভেসে উঠছে বারবার। যদিও সেটা শুরু থেকেই ছিলো। তৃষা যদিও জানে না যে, আমি আসলে কি করছি। কিন্তু তানভির এতক্ষণে তৃষাকেও সেটা বলে দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। আর তাই তৃষাও আমার থেকে দূরে সরে থাকছে। তানভিরকে বললাম, “আপনার ঘুম চলে আসলে ঘুমিয়ে যেতে পারেন।”

তৃষা তানভিরকে বললো, “হ্যাঁ চলো, আমরা ঘুমিয়ে যাই। আপনারা গল্প করুন!”

নাদিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে। নাদিয়া বেশ খুশি। কারণ সে এতক্ষণে আমার সাথে একাকী গল্প করার সুযোগ পেয়েছে। এতক্ষন ধরে সে তো এটাই খুঁজছিলো।

আমি নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। নাদিয়া বললো, “তারপর, বলুন!”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কি বলবো?”

নাদিয়া বললো, "যা ইচ্ছে!"

আমি বললাম, "আমি আসলে যা ইচ্ছে বলতে পারি না। অপর পক্ষের প্রশ্ন করতে হয় আমাকে নাহয় যেকোনো একটা সিচুয়েশনের দরকার পড়ে।"

নাদিয়া বলো, "আচ্ছা আমি তাহলে প্রশ্নই করছি! আচ্ছা, আপনার ধর্ম কোনটা?"

আমি বললাম, "সরাসরি এই জ্বলন্ত প্রশ্নে চলে গেলেন? যাই হোক। আমি স্যাটানিস্ট!"

নাদিয়া বললো, "দেশে স্যাটানিস্ট আছে বলে জানতাম না তো!"

আমি বললাম, "দেশে ইহুদী নেই। কিন্তু স্যাটানিস্ট আছে। কারন আমরা অদেখা জিনিসে বিশ্বাস করতে আর সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পছন্দ করি। নিজের বর্তমান স্বত্তাকে লুকোনোর জন্য আমরা অসীম ক্ষমতার দ্বারে গিয়ে কড়া নাড়ি। এটা আমাদের স্বভাব!"

নাদিয়া বললো, "হ্যা! আর নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ তো সবারই আছে। তাই না?"

আমি হাসলাম। নাদিয়াও মুচকি হাসলো!

আমি বললাম, "আপনি মুসলিম কেনো?"

নাদিয়া থমকে গেলো! তারপরে বললো, "বাবা-মা মুসলিম বলে!"

আমি বললাম, "সেটাই তো! কখনো নিজের ধর্ম নিয়ে গবেষণা করলে বুঝতে পারবেন যে আসলে সব ধর্ম সমান। সব ধর্মের মানুষ সমান। প্রত্যেক ধর্মই ক্ষমতা এবং সুখ দেয়ার অঙ্গিকার রাখে। কেউ বেঁচে থাকতে আর কেউ মারা যাবার পর। কিন্তু হ্যা! কোনো না কোনো ধর্ম সঠিক। বিজ্ঞান যদিও ধর্মকে প্রমাণ করতে পারে না কিন্তু বিজ্ঞান সুপারন্যাচারাল ক্ষমতাকে আলাদা ভাগ করে দিয়েছে, যেটাকে বলে সাইকোলজি।"

নাদিয়া জিজ্ঞেস করলো, "কীভাবে? ধর্মের সাথে সাইকোলজি কানেক্টেড কেনো?"

আমি বলতে শুরু করলাম, "ধরুন আপনার হাতে ব্যাথা করছে। হাত দেখতে পাচ্ছেন! তাই না? এর ওষুধ দেয়া যাবে তাই তো? এবার ধরুন আপনার হৃদয় কেউ ভেঙে দিয়ে গেলো। হৃদয় দেখাতে পারবেন আমাকে? বা হৃদয়ের ব্যাথা? সম্ভব না। আর তখনই দেখবেন সেটা গিয়ে সাইকোলজিতে ঢুকছে। আর হৃদয় ভাঙার যে ব্যাথা সেটা মূলত সাইকোলজিতে একটা মেটাফোর ছাড়া আর কিছুই না। এটা মূলত ইন্টেনসড ইমোশনাল স্ট্রেস বা পেইনের মেটাফোর বা রুপক।"

আমি সিগারেট ধরাতে চাইলাম। কিন্তু নাদিয়া সিগারেট টান দিয়ে নিয়ে গেলো।

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে আবারো বলতে শুরু করলাম, ‘‘তো যেটা বলছিলাম। সাইকোলজির একটা বিশেষ অংশ হচ্ছে প্যারাসাইকোলজি। যখন সাইকোলজিস্টরা কোনো প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিয়ে পায় না তখন সেটাকে প্যারাসাইকোলজিতে ফেলে দেয়। আর প্যারাসাইকোলজিতে ধর্ম থেকে শুরু করে একেবারে জাদুবিদ্যার প্রয়োগসহ প্রায় সবকিছু নিয়েই বলা হয়েছে। এবার বুঝলেন কীভাবে সাইকোলজি ধর্মের সাথে যুক্ত?’’

আমি খেয়াল করছিলাম যে নাদিয়া আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমিও এটাই চাইছিলাম আসলে!

নাদিয়ার চোখে আমার চোখ পড়তেই সে চোখ সরিয়ে নিলো। সে তাড়াহুড়ো করে প্রশ্ন করলো, ‘‘আচ্ছা আপনি কি বলতে পারবেন যে, কোনটা সঠিক ধর্ম?’’

আমি উত্তর দিলাম, ‘‘না! এটা বলা সম্ভব না। প্রত্যেকেই তার নিজের ধর্মকে সঠিক বলবে স্বাভাবিক। কিন্তু যদি আপনি ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে সঠিক বা ভুল বাছাই করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, ইশ্বর বা আল্লাহ বা ভগবান বা গড একজনই। তিনি কে সেটার প্রমাণ আপনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে সেই ধর্মগুলো অনুসারে পাবেন। বিজ্ঞানের ভাষার সেই ইশ্বর বা আল্লাহ হচ্ছেন একজন সুপারন্যাচারাল অস্তিত্ব, যিনি অসীম আর নিরাকার। কিন্তু সে কে এটা আপনি বলতে পারবেন না। না বিজ্ঞান আপনাকে এর সঠিক উত্তর দেবে না কোনো ধর্ম! আবারো বলছি, ধর্ম আছে। ধর্মের অস্তিত্ব আছে। ইশ্বর আছেন। তিনি কে বা কোন ধর্মের ইশ্বর সঠিক সেটা বলাটা মুশকিল...!’’

এটা বলে শেষ করার আগেই নাদিয়া আমার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বসলো। নাদিয়ার ঠোঁট আমার ঠোঁটের নিচের অংশের সাথে লেগে আছে। আমি কিছু বলে উঠার আগেই নাদিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরলো...!

রাত অনেক হয়েছে। দুটোর উপরে বাজে। তানভির আর তৃষা শুয়ে আছে। নাদিয়া আমার বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। নাদিয়া মেয়েটাকে কাছ থেকে এই আবছা আলোছায়ায় পরীদের মতো লাগছে। আচ্ছা, পরীদের কেউ কখনো দেখেছে? তাদের আসল রুপ? তাহলে তারা সুন্দর কি না সেটা না জেনেই আমরা কি মানুষকে পরীদের সাথে মেলাচ্ছি না? তাদের আসল রুপ তো ভয়ঙ্কর হতে পারে! সেক্ষেত্রে?!

আমার চিন্তায় বাধা পড়লো তানভিরের ডাকে। তানভির আর তৃষা তাদের বিছানা ছেড়ে উঠেছে। আমিও নাদিয়াকে এক পাশে শুইয়ে দিয়ে বিছানা থেকে উঠলাম। প্যান্ট শার্ট পড়লাম।

তানভির নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, "এখনই করবেন?"

আমি হ্যাসূচক মাথা নাড়লাম।

তৃষা প্রচন্ড ভয় পেয়ে আছে। তানভীরও তৃষার পাশে গিয়ে বসলো। তারা জানে কি হতে যাচ্ছে! তারা কখনো এটা আগে দেখে নি। তারা ভাবতেও পারছে না তাদের চোখের সামনে আমি এই জঘন্য কাজটা করতে যাচ্ছি!

আমি বাথরুমে গেলাম। বাথরুম থেকে এক মগ পানি নিয়ে আসলাম। তানভীর আর তৃষা একইসাথে অবাক আর ভীত চোখে তাকিয়ে আছে।

যে বিছানায় নাদিয়া শুয়ে আছে সেটার উপরে উঠলাম। তাকে পিঠে ভর দিয়ে শুইয়ে দিলাম। নাদিয়া কিছুটা গোঙানোর মতো শব্দ করে উঠলো। তারপরেই আবার শ্বাস গভীর হতে শুরু করলো। ওর গালের উপর চুল এসে পড়েছিলো। আমি আস্তে করে চুলগুলোকে সরিয়ে দিলাম। তানভির আর তৃষার দিকে তাকাতেই দেখি তানভিরকে জড়িয়ে ধরে আছে তৃষা। তারা দুজনেই এখন ভীত আর প্রচন্ড রকমের অবাক!

নাদিয়ার শরীরে কোনো কাপড় ছিলোনা। শুধু ব্রা পড়নে ছিলো। তার বুকের উপর পাঁচ ফোঁটা পানি ফেললাম। তারপর বিছানার নিচ থেকে বইটা বের করলাম। বইটা থেকে শাফিনের চুলের একটা টুকরো বের করলাম। সেটাকে নাদিয়ার মুখের ভেতরে দিলাম।

এখন আমার হাতে নাদিয়া আর শাফিন দুজনেরই ডিএনএ স্যাম্পল আছে। এবার পড়তে শুরু করলাম।

"স্যাটানা পারাকালো দিয়াফোতিস্তে আফতা তা দায়িগ্মাতা কাই পারাকালো সিন্দেস্তে মেতাক্সি তুয়োস!"

সাথে সাথেই আমার হাতের মধ্যে থাকা চুলটা জ্বলে উঠলো। মনে হচ্ছে চুলটা আসলে কোনো আলোর গোলক!

হাতের ইশারায় তানভির আর তৃষাকে চোখ বন্ধ করতে বললাম। তারা চোখ বন্ধ করতেই আমি নাদিয়ার অ্যাস্ট্রাল বডিকে দেখতে পেলাম। নাদিয়ার অ্যাস্ট্রাল বডি মাত্রই তার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। সেটা আমাকে আটকানোর চেষ্টা করবে। আর তা করার আগেই আমাকে যা করার করতে হবে।

আমি নাদিয়ার বুকের বাঁ পাশে আমার পাঁচ আঙুল বসিয়ে দিলাম। নাদিয়া গুঙরে উঠেছে। তার চোখ খুলে গেলো। সে আমাকে তার উপরে দেখতে পেলো। কিছু বুঝের উঠার আগেই তার বুকের চামড়া ভেদ করে আমার পাঁচ আঙুল ঢুকে গেলো। আর সাথে সাথেই নাদিয়া আমার দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকালো। আমিও নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। মৃদু একটা হাসি দিয়ে সে জ্ঞান হারালো।

নাদিয়া বুক থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়তে শুরু করলো। আমি সেই রক্তের সাথে শাফিনের সেই চুলের টুকরো মেশালাম। চুলটাকে আমার সেই বইয়ের ভেতর রাখলাম। তানভির আর তৃষা এখনো চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

নাদিয়ার উপর থেকে উঠলাম। সে জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে আছে।

তানভির আর তৃষা নাদিয়াকে জাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না আসলে নাদিয়াকে উঠানো এতটা সহজ হবে না। কারণ নাদিয়া মাত্রই স্ট্রোক করেছে। সে শুধু জ্ঞানই হারায় নি, তার ছোটোখাটো একটা স্ট্রোক হয়েছে। অতিরিক্ত ভয় পাওয়ার কারণেই এটা হয়েছে।

আমি নেক্সট স্টেশনে নেমে পড়বো ভাবছি! ব্যাগ গুছিয়ে সবাইকে সে অবস্থায় রেখেই নেক্সট স্টেশনে নেমে গেলাম।

নাদিয়ার জন্য খারাপ লাগছিল। যদিও নাদিয়া মারা যাবে না এখনই। কিন্তু নাদিয়ার রক্তের গ্রুপ এখন প্রত্যেক তিন মাস পর পর পরিবর্তন করতে হবে। সেটা না করলে নাদিয়া মারা যাবে।

কোন স্টেশনে নেমেছি আমি জানি না! চিটাগাংয়ের আশেপাশে কোথাও আছি সেটা অবশ্য জানি। যাই হোক, আজকের রাতটা কোথাও থেকে কাল সকালে নাহয় আবার সিলেটে ব্যাক করবো। রাস্তায় হাটছি আর ভাবছি, “শাফিনের সাথে নাদিয়ার অবস্থান আর রক্ত পরিবর্তন করে দিয়েছি। এখন আর শাফিনের রক্ত তিন মাস পর পর পরিবর্তন করার সমস্যা থাকবে না। শাফিন এখন সুস্থ। আর নাদিয়া? হ্যাঁ! নাদিয়াও সুস্থই। কিন্তু শাফিনের অবস্থানে এখন ভুগতে হবে নাদিয়াকে!”

মানুষের অনুভূতিগুলো বড়ই অদ্ভুত! ঠিক পয়সার মতো। যার একদিকে থাকে রাগ, অন্যদিকে অভিমান। যার একদিকে থাকে ভালোবাসা, অন্যদিকে হিংসা। যার একদিকে থাকে কৃতজ্ঞতা, অন্যদিকে ঘৃণা। যার একদিকে সে মানুষ, অন্যদিকে সেই অমানুষ!

সমাপ্ত